মশলার গুণে জব্দ হবে কোলেস্টেরল

কোলেস্টেরল শুনলেই মাথায় নেতিবাচক চিন্তা ভর করে। অথচ শরীরের জন্য কিন্তু এটি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। বিপত্তি ঘটে তখনি যখন লোডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন কোলেস্টেরল বা এলডিএলের মাত্রা বেড়ে যায়। খারাপ কোলেস্টেরল ধমনীতে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে ক্লান্তি আনে। এর কারণে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি পর্যন্ত তৈরি হয়। আপনি চাইলেই কিন্তু ঘরোয়া উপায়ে কোলেস্টেরল মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এর সমাধান রয়েছে রান্নাঘরে।

দারচিনি
দারচিনিতে থাকা সিনাম্যালডিহাইড নামক যৌগটি রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। রক্তে থাকা এই শর্করার প্রভাব পড়ে ট্রাইগ্লিসারাইডের ওপর। শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখলে কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

মেথি
মেথিতে থাকা স্যাপোনিনস নামক যৌগটি কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি রক্তে শর্করার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এটা সাহায্য করে।

আদা
আদায় থাকে জিনজেরলস ও শোগাওলস নামক দুটি যৌগ। এগুলো রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। ফলে ধমনীতে মেদ জমতে পারে না সহজে।

হলুদ
হলুদে রয়েছে কারকিউমিন। বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে, কারকিউমিন যৌগটিই রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। পাশাপাশি ভালো কোলেস্টেরল অর্থাৎ ‘এইচডিএল’-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

গোলমরিচ
এই মশলায় রয়েছে প্যাপরিন নামক একটি যৌগ। যা রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। গোলমরিচের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর যৌগ হৃদরোগে

আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

সূত্র: ইত্তেফাক

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে যা খাবেন

কোলেস্টেরল এক ধরনের চর্বি। এটি দেখতে অনেকটা মোমের মতো নরম। এটি আমাদের দেহের কোষের দেয়ালে থাকে। আমরা যখন চর্বিজাতীয় খাবার খাই, তখন আমাদের যকৃতে এই কোলেস্টেরল তৈরি হয় ও রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে আমাদের দেহের সমস্ত রক্তনালিতে ছড়িয়ে পড়ে।

এটি শরীরের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। যেমন: হরমোন তৈরিতে, চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর পরিপাকে ও ভিটামিন ডি তৈরিতে। যদি অধিক পরিমাণ চর্বিজাতীয় খাবার খাওয়া হয় তবে এই অতিরিক্ত কোলেস্টেরল ধমনির দেয়ালে জমাট বেঁধে প্লাক তৈরি করে ও রক্ত চলাচলে বাধা দেয়। ফলে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা যায়। উচ্চ রক্তচাপ, হৃৎপিণ্ডের নানা ধরনের অসুখ, হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি।

সাধারণত দুই ধরনের কোলেস্টেরল আছে। একটি লো ডেনসিটি লাইপো প্রোটিন (এলডিএল) ও অপরটি হাইডেনসিটি লাইপো প্রোটিন (এইচডিএল)। এলডিএল ধমনির দেয়ালে ক্ষতিকর প্লাক তৈরিতে সাহায্য করে, তাই একে খারাপ কোলেস্টেরল বলা হয়। আর এইচডিএল ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এলডিএল কোলেস্টেরলকে সরিয়ে দিতে সাহায্য করে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। এ জন্য এটিকে ভালো কোলেস্টেরল বলা হয়। রক্তে এলডিএলের স্বাভাবিক মাত্রা হলো কমপক্ষে ১০০ মিলিগ্রাম পার ডিএল। এইচডিএলের স্বাভাবিক মাত্রা ৪০ থেকে ৬০ বা তার বেশি মিলিগ্রাম পার ডিএল।

কিছু খাবার রয়েছে, যা কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে। আসুন জেনে নিই এমন কিছু খাবার সম্পর্কে:

পেতে পারেন ক্যালসিয়াম, ল্যাকটোব্যাসিলাস মাইক্রো-অর্গানিজম; যেগুলো কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।

ভিটামিন সি রয়েছে সব ধরনের সাইট্রাস ফলে। যেমন: কমলা, গ্রেপফল, লেবু ইত্যাদি। সব ধরনের বেরি জাতীয় ফল। যেমন: ক্র্যানবেরি, স্ট্রবেরি, ব্ল্যাকবেরি ইত্যাদি। পেয়ারা ও আমের মধ্যেও ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এছাড়া ক্যাবেজ বা পাতাকপি পরিবারের খাবারেও আছে ভিটামিন সি। যেমন: সবুজ বা চায়নিজ পাতাকপি, ব্রকোলি ইত্যাদি। ভিটামিন সি-এর আরেকটি ভালো উৎস হচ্ছে মরিচ।

সব ধরনের সবজি ও ফল কোলেস্টেরলের মাত্রাকে কমাতে সাহায্য করে। বিশেষত যেসব সবজিতে ভিটামিন সি ও বিটা ক্যারোটিন রয়েছে সেগুলো বেশি খেতে হবে। গাঢ় হলুদ ফলে বিটা ক্যারোটিন রয়েছে। যেমন: আম, হলুদ পিচফল, কাঁঠাল ইত্যাদি। সবজির মধ্যে যেমন: কুমড়া, মিষ্টি আলু, কাঠবাদাম, গাজর ইত্যাদির মধ্যেও বিটা ক্যারোটিন রয়েছে। এছাড়া গাঢ় সবুজ সবজি যেমন: ব্রকোলি, পাতাকপি ইত্যাদি খেতে হবে শরীরে বিটা ক্যারোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য। যদি আপনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন ও কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পায় তবে অবশ্যই নিয়মিত খাদ্যতালিকায় এগুলো রাখতে হবে।

সব ধরনের অপ্রক্রিয়াজাত দানাজাতীয় খাবারে ভিটামিন বি ও মিনারেলস রয়েছে। এগুলো চর্বি ও কোলেস্টেরল কমায়। এ ধরনের খাদ্য যেমন: রুটি, গম, ভুট্টা, ওটমিলস ইত্যাদি। ওটস-এর মধ্যে রয়েছে হাই সলিউবল ফাইবার যা কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে বেশ কার্যকর। এই খাবারগুলো নিয়মিত আপনার খাদ্য তালিকায় রেখে শরীরে কোলেস্টেরলের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

সূত্র: ইত্তেফাক

পাতা দিয়েই জন্মাবে গাছ

শৌখিনতা থেকে অনেকে আজকাল ঘরের ভেতর বাগান করার চেষ্টা করেন। বাগান করার মাধ্যমে ঘরের পরিবেশের নির্মলতা নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টাও থাকে। অনেকে নিজেই ঘরের ভেতর গাছ বীজ থেকে চারা

বানানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ভালো বীজ সংগ্রহ ও বীজ থেকে চারা গজানোর প্রক্রিয়াটি সহজ নয়। কিন্তু সব গাছের ক্ষেত্রে বীজের প্রয়োজন হয় না। কিছু গাছ পাতা দিয়েই জন্মানো সম্ভব। ইনডোর প্লান্টের ক্ষেত্রে যেসব গাছের বীজ প্রয়োজন হয় না সেসব গাছ নিয়েই আজকের আলোচনা।

অ্যালোভেরা
কটি অ্যালোভেরার পাতা নিন ও কিছু সময় শুকানোর জন্য ছায়ায় রাখুন। এরপরে কাটা পাতার নীচের অংশ শুকিয়ে গেলে টবে রোপণ করুন। প্রতিদিন এর ওপর অল্প অল্প পানি দিতে থাকুন। কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন নতুন পাতা উঁকি দিচ্ছে। অ্যালোভেরার ওষুধি গুণ রয়েছে। আর সেটি আপনার জন্যও অনেক ভালো। বাড়িতেই অ্যালোভেরা চাষ করতে পারা ভালো একটি সুবিধা।

রাবার গাছ
টবে মাটি দিয়ে ভর্তি করে নিন। তারপর রাবার গাছের পাতা টবে রোপণ করুন ও পানি ছিটিয়ে দিন। এরপর টবটিকে রৌদ্রোজ্জ্বল জায়গা থেকে দূরে রাখুন যেখানে প্রচুর আলো রয়েছে। ১৫-২০ দিনের মধ্যে গাছ বড় হতে শুরু করবে। রাবার গাছ বাড়ির ভেতর লাগালে সুবিধা কি? ঘরের বাতাস পরিশোধনের কাজটি করে রাবার গাছ।

বেলি ফুল
একটু পরিচিত প্লান্টের দিকে এবার তাহলে তাকানো যাক। বেলির সুঘ্রাণ তো সবারই পছন্দ। একটি মাঝারি আকারের টবে কম্পোস্ট মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভরাট করুন। এরপর তাতে পুরনো বেলি ফুল গাছ থেকে একটি ডাল নিন। তারপর এই ডাল টবে রোপণ করে পানি দিন। পাত্রটি এমন জায়গায় রাখুন যেখানে গাছটি হালকা সূর্যের আলো ও বাতাস পাবে। মাসখানেকের মধ্যে নতুন গাছ গজাবে।

স্নেক প্লান্ট
ইনডোর প্লান্টের মধ্যে স্নেক প্ল্যান্ট ব্যাপক জনপ্রিয়। এই গাছ গজানোর জন্য আসলে কোনো বীজের প্রয়োজন হয় না। স্নেক প্ল্যান্টের একটি বড় পাতা নিতে হবে। এরপর পাতাটিকে দুই ভাগে কেটে নিন। টবে রাখা মাটিতে রোপণ করুন। এরপর পানি ছিটিয়ে দিন। এক মাসের মধ্যেই নতুন স্নেক প্ল্যান্ট তৈরি হয়ে যাবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

বর্ষায় স্যাঁতস্যাঁতে মুক্ত থাকুক ঘর

গ্রীষ্মের অস্বস্তি ও তাপদাহের পর প্রশান্তি নিয়ে আসে বর্ষাকাল। কিন্তু একটানা বৃষ্টিতে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে জনজীবন। বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টি শুধু বাইরে নয়, ঘরের ভেতরেও সমস্যা দেখা দেয়। এই সময়ে বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ায় ঘরে দেখা দেয় স্যাঁতস্যাঁতে ভাব। বর্ষাকালে ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর করতে চলুন জেনে নেই কিছু উপায়-

. মোটা ও ভারি ধরনের দরজা-জানালার পর্দা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে
হবে। মোটা কাপড় বাতাস থেকে আর্দ্রতা বেশি শোষণ করে। এতে করে পুরো ঘরের আবহাওয়া জুড়ে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব বিরাজ করে। এছাড়া হুটহাট বৃষ্টিতে পর্দা ভিজে গেলে শুকাতে দীর্ঘসময় প্রয়োজন হবে যদি ভারি কাপড়ের পর্দা হয়। তাই এই সময়ে হালকা কাপড়ের পর্দা নির্বাচন করতে হবে।

. রোদের প্রকোপ ঠেকাতে পুরো গ্রীষ্মকাল জানালায় গাঢ় রঙের ভারী
পর্দা টাঙিয়ে রাখেন অনেকে। মোটা ও ভারী কাপড়ের পর্দা বাতাস থেকে আর্দ্রতা বেশি শোষণ করে। এতে পুরো ঘর স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়। এবার সেগুলো নামিয়ে ফেলুন। হালকা রঙের পাতলা পর্দা টাঙিয়ে দিন এই বর্ষায়। এতে ঘর স্যাঁতস্যাঁতে হবে না।

. বর্ষাকালে স্বাভাবিকভাবেই ভেজা কাপড় শুকাতে দীর্ঘসময় প্রয়োজন
হয়। ফলে অনেকেই ভেজা কাপড়চোপড় ঘরে ফ্যানের নিচে এনে শুকাতে দেন। এতে করে ঘর আরও বেশি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে ওঠে। তাই বর্ষাকালে যথাসম্ভব সীমিত কাপড় ধুতে হবে এবং ঘরের ভেতরে শুকাতে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে তবেই শুকাতে হবে।

. ঘরের মেঝে অপরিষ্কার রাখলে পুরো বাড়িই অপরিষ্কার হয়ে যায়। তাই
প্রতিদিন নিয়ম করে ঘরের মেঝে অবশ্যই মুছতে হবে। কিন্তু বর্ষাকালে এমনিতেই মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে। মেঝেতে পা দিলে দেখা যায় ভেজা ভেজা ভাব রয়েছে। এর মাঝেও মেঝে পরিষ্কার করতে চাইলে পানির সাথে মিশিয়ে নিতে হবে ফিনাইল। এতে মেঝে দ্রুত শুকিয়ে যাবে।

. সাধারণত ড্রইংরুমে কার্পেট বিছানো হয়। মোটা বুননের কার্পেট অনেকখানি আর্দ্রতা শোষণ করে ও ভেজা ভেজা হয়ে থাকে। যা থেকেও ঘরে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বর্ষাকালের জন্য কার্পেট গুটিয়ে তুলে রাখতে হবে।

. বর্ষায় ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থেকে গন্ধের উৎপত্তি হয়। বিশেষত যাদের বাড়িটি বহুকাল আগের ও পুরনো ধাঁচের কিংবা বেশখানিকটা ভেতরের দিকে, তাদের বাসাবাড়িতে এই সমস্যাটি বেশি দেখা দেয়। এমন সমস্যার ক্ষেত্রে দুই কাপ পানিতে মাঝারি আকৃতির একটি দারুচিনি ফুটিয়ে নিতে হবে। এতে করে পুরো ঘর জুড়েই দারুচিনির সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়বে।

. তাজা লেবুর রসের মাধ্যমেও এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তাজা লেবুর রস চিপে নিন ১ কাপের মতো। এবার এতে আধা কাপ পানি মিশিয়ে মিশ্রন তৈরি করুন। একটি স্প্রে বোতলে এই মিশ্রণটি নিয়ে ঘরের প্রতিটি কোনায় মেঝেতে এবং দেয়ালে স্প্রে করে দিন ভালো করে। দেখবেন স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ একেবারেই গায়েব হয়ে গিয়েছে।

সূত্র: ইত্তেফাক

বৃষ্টিদিনে চলতি পথের প্রস্তুতি

বৃষ্টিদিনে প্রকৃতির রূপ যতই ভালো লাগুক, বৃষ্টির বিড়ম্বনাও কিন্তু কম নয়। ঘর থেকে বের হতে না পারা, রাস্তাঘাটে কাদাপানি, চলতি পথে হঠাৎ বৃষ্টিতে কাদাজলে একাকার হওয়াসহ নানা ঝক্কি পোহাতে হয়। তাই বলে বৃষ্টি উপভোগ করবেন না তা কি হয়! বৃষ্টি দিনে বৃষ্টি হোক বা না হোক ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কিছু প্রস্তুতি নিয়ে বের হোন।

. বর্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হল ছাতা। হঠাৎ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে এ সময় বৃষ্টি হোক বা না হোক ছাতা ছাড়া বাইরে যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

ছাতাতে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটি নিরাপদে রাখা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। তাই এ আবহাওয়ার জন্য বেছে নিন ওয়াটার প্রুফ ব্যাগ।

. বৃষ্টি বাদলের এ সময়টা সুতি কাপড়ের বদলে আরামদায়ক জর্জেট, সিল্ক কাপড়ের পোশাক পরুন। বৃষ্টিতে ভিজলেও তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

. বৃষ্টির দিনে কাপড় বা চামড়ার জুতা এড়িয়ে চলুন। বৃষ্টিতে এ ধরনের
জুতা যেমন নষ্ট হতে পারে তেমনি চামড়ার জুতা ভিজে পায়ে দুর্গন্ধও হতে পারে।
ফ্ল্যাট স্যান্ডেল আরামদায়ক হলেও এ সময় তা এড়িয়ে চলুন। কারণ ফ্ল্যাট স্যান্ডেল থেকে কাদা ছিটে কাপড় নষ্ট হয়। আবার কাদা লেগে পা নোংরাও হয়। তাই এ সময়টা একটু উঁচু এবং পা ঢাকা জুতা পরুন।

. বাইরে যাওয়ার সময় ছোট প্লাস্টিকের জিপার ব্যাগে মোবাইল,
হেডফোনসহ বিভিন্ন গ্যাজেট রাখুন। নয়তো সঙ্গে পলিব্যাগ রাখুন গ্যাজেট রাখার জন্য।

. বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে এখন একটু বড় হ্যান্ডব্যাগ ব্যবহার করতে
চেষ্টা করুন। আর সঙ্গে থাকা ব্যাগটিতে রেখে দিন প্রয়োজনীয় কসমেটিকস, রুমাল, ছোট টাওয়াল, টিস্যু।

. বর্ষায় হাত-পায়ে ইনফেকশন, চুলকানিসহ বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ
থেকে সুরক্ষিত থাকতে বাইরে থেকে ঘরে ফিরে সরাসরি গোসলে যান। গোসলে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে চেষ্টা করুন এবং পরিধেয় পোশাক একঘণ্টা ডিটারজেন্টে ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে দিন।

সূত্র: ইত্তেফাক

সুখের মূল সুস্বাস্থ্য

শহুরে জীবনে সারা দিনের চাকরি-ব্যবসার ব্যস্ততায় শরীরের দিকে নজর দেওয়ার সময় কোথায়। এদিকে, যা দিনকাল পড়েছে শরীর স্বাস্থ্যের যত্ন না নিলে রোগে ভুগে নাকাল অবস্থার মধ্যে পড়তেই হবে। আর কে না জানে, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই শহরে কি গ্রামে কিংবা

এই যে সচেতনতা বাড়ছে মানুষের এর প্রভাবে মানষের গড় আয়ুও বাড়তে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘রিপোর্ট অন বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস-২০২২’ শীর্ষক প্রতিবেদন বলছে, বর্তমানে নারীদের গড় আয়ু ৭৪ দশমিক ২ বছর ও পুরুষদের গড় আয়ু ৭০ দশমিক ৮ বছর। নিজেকে সতেজ আর নিরোগ রাখতে তাই স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ছে নগরীর মানুষের মধ্যে। নগরজীবনের ব্যস্ততায় শারীরিক পরিশ্রমের চেয়ে মানসিক পরিশ্রমই বেশি। ফলে, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসসহ নানা ধরনের রোগের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে হাঁটহাঁটি আর ব্যায়ামের প্রতি ঝুঁকছে নগরবাসী। ভোরের সূর্য ওঠার আগে থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন পার্ক ও উন্মুক্ত স্থানে সরব উপস্থিতি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের। হাতির ঝিল, ধানমন্ডি লেক, চন্দ্রিমা উদ্যান, রমনা পার্ক প্রভৃতি স্থানে মানুষের ঢল নামে। গুলশান, বনানী, উত্তরা, মিরপুর এলাকার পার্ক, উন্মুক্ত স্থান বা একটু প্রশস্ত রাস্তার ফুটপাথ ধরে হাঁটতে আর ব্যায়াম করতে দেখা যায় নগরবাসীকে। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ, তরুণ—সবাই আছেন এই ভোরে ভ্রমণকারীর দলে। কেউ দৌড়াচ্ছেন, আবার কেউ-বা বয়সের ধকলে লাঠিতে ভর করেও হাঁটছেন। তবে, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যে সকালেই হাঁটতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। যখন সময় পাবেন সেই সময়েই সেরে নিতে পারেন ব্যায়ামের কাজটা। আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্যায়ামের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় বিকাল বা সন্ধ্যা।

তবে, শুধু ব্যায়াম করলেই তো চলবে না। খাওয়া হতে হবে পরিমিত এবং স্বাস্থ্য উপযোগী। ডায়েটিশিয়ানরা বলছেন, সব খেতে পারেন, খেতে পারেন যত ইচ্ছা। শুধু ব্যায়াম করে সেই ক্যালরিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তা যদি না করেন, তবেই পরিধি বাড়বে শরীরের।

কিশোরদের ডায়াবেটিস: ঝুঁকি ও করণীয়

টিনএজ বা কিশোর বয়সে ডায়াবেটিস হতে পারে। তবে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় কম। করোনা মহামারির পর আমাদের জীবন-যাপনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আর এই পরিবর্তনের ফলে নানা শারীরিক সমস্যাও

বেড়েছে। খাবারে অনিয়ম, ফাস্টফুডে আসক্তি, দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম না মানা এসব নানা কারণে হরমোনাল ইমব্যালেন্সের পাশাপাশি ওজনও বাড়ে। এ বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করছেন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডা মো. দেলোয়ার হোসেন।

কিশোরদের ডায়াবেটিসের আরও কিছু সমস্যা
ওজন কমানোর জন্য অনেক টিনএজার ক্র্যাশ ডায়েট করে। বা হয়তো একদম কার্বোহাইড্রেট বাদ দিয়ে দেয় খাবার থেকে। মনে রাখতে হবে, মস্তিষ্কের কাজের জন্যও গ্লুকোজ়ের প্রয়োজন। সেই গ্লুকোজ় খাবারের মাধ্যমে শরীরে না পৌঁছালে হঠাৎ করে সুগার ফল করতে পারে। রিপিটেড হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে, শরীর ইনসুলিন রেজ়িস্ট্যান্ট হয়ে পড়ে। ফলে, ডায়াবেটিসের প্রবণতা আরও বাড়ে। আবার স্ট্রেসের ফলে স্ট্রেস হরমোন নিঃসৃত হয় বেশি, ইনসুলিন নিঃসরণ কমে। ঘুমের সময়ে হ্যাপি হরমোন রিলিজ় হয়। স্ট্রেসের ফলে ঘুম কম হয়, ফলে সুগার মেটাবলাইজ়ড হয় না। রক্তে শর্করা জমতে থাকলে ডায়াবেটিসের আশঙ্কা বাড়ে। মনে রাখা প্রয়োজন, টিনএজারদের সাধারণত টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস হলেও (শরীরে এক্ষেত্রে ইনসুলিন তৈরি হয় না) কিছু ক্ষেত্রে টাইপ টু ডায়াবেটিসও হতে পারে। অর্থাৎ, কারও শরীরে ইনসুলিন তৈরি হলেও তা যথাযথ কাজ করে না। এই দু’ক্ষেত্রে ওষুধ আর ডায়েট, আলাদা আলাদা হয়।

ডায়াবেটিসের ধরন বুঝে খাওয়া-দাওয়া

1.কিশোর বয়সে ডায়াবেটিস হলে ডায়াবেটিসের ধরণ বুঝে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনতে হবে। ফাস্টফুডের বিকল্প অবশ্যই খুঁজে নিতে হবে। পুরোপুরি এড়িয়ে চলা সম্ভব না হলেও, একদম খালি পেটে জাঙ্ক ফুড না খাওয়াই ভালো।
2. ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সারাদিনের নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণের একটি মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়। সারাদিনের খাবারে ক্যালরি সেই অনুপাতেই ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।
3. ইমার্জেন্সি সুগার ফল করার আশঙ্কা থাকলে সঙ্গে ক্যান্ডি, গ্লুকোজ় ওয়াটার ক্যারি করা ভাল। তবে সিভিয়ার ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা জরুরি। টিনএজ মেয়েদের, যাদের হেভি ব্লিডিং হয়, তারা যদি কড়া ডায়েটে থাকে তাহলে এই দুয়ে মিলে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনেকটা কমে যেতে পারে। এদের টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস থাকলে, জটিলতা বাড়তে পারে। কিডনি বা কার্ডিয়াক সমস্যা বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে হাই প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট নিতে হতে পারে।

4. টাইপ টু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে অনেকের হয়তো ফাস্টিংয়ে সুগারের মাত্রা বেশি থাকে। এদের ক্ষেত্রে রাতে ঈষদুষ্ণ গরম দুধে দু’তিনটে কাঠবাদাম ভিজিয়ে খাওয়ার নিয়মিত অভ্যাস গড়ে নেওয়া ভালো। আবার পিপি বেশি থাকলে, সকালের মাঝামাঝি কোনো সময়ে যেকোনো একটি ফল ও প্রোটিন খাওয়া ভালো। গোটা ফল, টক দই খাওয়ার দেড়-দু’ঘণ্টা পরে দুপুরের খাবার খেতে মানা নেই।

5. যেহেতু টিনেজার তাই অনেক সময় অনেকের ফাস্টিং ও পিপি, দুই-ই নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু ডায়াবেটিসের লক্ষণ তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তখন এইচবিএওয়ানসি (HbA1c) টেস্টে হয়তো ধরা পড়ল সুগারের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত। তাদেরকে নিয়মিত মনিটর করা প্রয়োজন। টাইপ ওয়ান বা টু, দু’ধরনের ডায়াবেটিসেই সিম্পল কার্বোহাইড্রেট (চিনি, মিষ্টি) একদম না। বিস্কিট ও মুড়ি এড়িয়ে চলা ভালো।
6. ছোট ছোট ফ্রিকোয়েন্ট মিল উপকারী, আর প্রতিটি মিলেই অন্তত একটি প্রোটিন আইটেম যেন থাকে। অর্থাৎ, সারাদিনে যদি ৫০ গ্রাম প্রোটিন থাকে, তা যেন চারটি মিলে ভাগ করা থাকে। সিডস ও নাটস সুগারের মাত্রা ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
7. এখন ইয়ং অ্যাডাল্টদের মধ্যেও হার্টের অসুখের উদাহরণ বাড়ছে। এর অন্যতম কারণ হতে পারে সুগার ফ্লাকচুয়েশন। ডার্ক চকোলেটও ভাল। এর সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন অ্যাক্টিভিটি। ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ় ও যোগব্যায়ামের মাধ্যমে হরমোনাল ইমব্যালেন্স অনেকাংশে দূর করা যায়।

মস্তিষ্কের সুরক্ষায় করুন নিয়মিত শরীরচর্চা

দেহ সুস্থ-সবল রাখতে ব্যায়ামের জুড়ি নেই। এর বাইরে নতুন খবর হলো ব্যায়াম করলে মস্তিষ্কের ভেতরের কোষদের মধ্যকার যোগাযোগ বাড়ে। এতে ডিমেনশিয়ার মতো সমস্যা সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশেষত নিয়মিত ব্যায়াম করেন এমন বয়স্ক মানুষরা মানসিক ব্যাধিতে কম আক্রান্ত হন।

এ বিষয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত মেমরি অ্যান্ড এজিং সেন্টারে কর্মরত নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর কেইটলিন ক্যাসেলেটো জানান, ‘মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সিন্যাপ্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মানসচিন্তা এবং স্মৃতি মূলত এই সিন্যাপসেরই প্রভাবপ্রসূন ফল।’

কেইটলিনের গবেষণা থেকে জানা যায়, শরীরচর্চা আমাদের মস্তিষ্কে ডিমেনশিয়ার আশঙ্কা ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ হ্রাস করে। তিনি জানান, ‘মস্তিষ্কের জটিল গঠনের কথা বিবেচনা করে দেখলে, সুস্থ শরীরচর্চা মস্তিষ্কে কিছু স্বাভাবিক সিগন্যাল প্রদান করে। এতে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা এবং সুস্থতা নিশ্চিত হয়।’

এক্ষেত্রে প্রোটিন ব্যবস্থাপনই আসল
মূলত মস্তিষ্ক সিন্যাপসের মাধ্যমে নিউরন থেকে নিউরন এবং দেহের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। তাই ক্রমশ ধুকতে শুরু করা বা ক্ষয়প্রাপ্ত প্রোটিনের প্রতিপূরক জরুরি হয়ে পড়ে। কেইটলিন এক পর্যায়ে জানান, ‘আমাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন পাওয়া যাবে। প্রতিটি প্রোটিনই ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।’

এই প্রক্রিয়াতেই মস্তিষ্ক নিজেকে পুনর্বিন্যস্ত করার সুযোগ পায়। ফলে মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে। আলজেইমার কিংবা ডিমেনশিয়ার ক্ষতি হ্রাস করতে শারিরীক কসরতের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষত বয়স্ক যারা তাদের সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট শারিরীক ব্যায়াম বা কার্যক্রমে নিজেকে জড়ানো উচিত। তবে যেকোনো ব্যায়াম করলেই ফলাফল পাওয়া যাবে এমন না। কেইটলিনের গবেষণা জানায়, বয়সের উপর ভিত্তি করে ফলাফল বিভিন্ন হতে পারে। তবে সচরাচর এমন ব্যায়ামই খুঁজে নেয়া উচিত যা আনন্দদায়ক। বিশেষত বয়স্কদের উচিত নতুন কোনো ব্যায়াম শুরু করা। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রথমে পরামর্শ করে নিতে হবে।

এই বিষয় নিয়ে আরো গবেষণা হচ্ছে। তবে ডিমেনশিয়া কিংবা বিভিন্ন মানসিক ব্যাধি প্রতিরোধে শারিরীক কার্যক্রম এবং ভালো লাগার সম্পর্ক জরুরি। একইসঙ্গে খাদ্যতালিকায় প্রোটিনের মাত্রা বৃদ্ধি এবং সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। এতে যেকোনো বয়সেই (বিশেষত বয়স্কদের) মানসিক ব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

[redacted] [redacted] a [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

এখনই সময় জাফলং যাওয়ার

ভরা বর্ষায় টইটম্বুর জাফলং যাওয়ার জন্য বাইশে শ্রাবণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার কি দরকার। সুযোগ বুঝে একটা ব্রেক নিন।

গবেষণায় দেখা গেছে, জীবনীশক্তি বাড়ানোর জন্য পাহাড় আর বনে ঘুরতে যাওয়াই ভালো। দূষণে ভরা নগরজীবনের ক্ষেত্রে তাই পথ আর কোথায়? ঠিক আছে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের জন্য পাহাড়ে যাবেন। কিন্তু সেখানের একঘেয়েমি থেকে একটু সারল্যমাখা সৌন্দর্য কি আকাঙ্ক্ষিত নয়? হ্যাঁ, তা তো বটেই। সেজন্যই তো জাফলং এর কথা বলছি। এখানে বারবার গেলেও বিরক্তি আসবে না।

সিলেটের বাস পাওয়া সমস্যা নয়। গাবতলী, কল্যাণপুর, মহাখালী, সায়দাবাদ, মতিঝিল, মিরপুর এমনকি উত্তরা থেকেও সিলেটের বাস পাবেন। আর যদি মনে হয় সত্যজিৎ বা কলকাতার সাহিত্যের স্টাইলে ভ্রমণ করবেন তাহলে ট্রেনের বগিই ভরসা।



জাফলং সিলেটের গোয়াইনঘাটে, মেঘালয় ও বাংলাদেশ সীমান্তে খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। শহর থেকে এর দূরত্ব ৬২ কিলোমিটার। বর্ষার শুরুতে বা শেষে গেলেই এর আসল সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়। সিলেট শহর থেকে জাফলং যেতে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। পাবলিক বাস, রিজার্ভ গাড়ি বা লেগুনায় করে যাওয়া যায় জাফলংয়ে। যাওয়ার পথটাই তো মজার। যাওয়ার পথে আপনি দেখা পাবেন বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর রাস্তার মধ্যে একটির। অন্তত সেখানে যারা গিয়েছেন একবার তারা এ কথা সবসময় বলেন। এই রাস্তা ধরে জৈন্তাপুর থেকে জাফলং যেতে সব ঝরনা ভারতের দিকে। তাই এপারে দাঁড়িয়ে হতাশ পথিকের মতো শুধু তাকিয়ে থাকতে হয়। সে আক্ষেপ থাকলো। কিছু তো করার নেই। তারপরও শান্তি আছে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ের মধ্যে এই পথে যেতে যেতে আপনি দেখা পাবেন সারি সারি চা-বাগান, হজরত (রা.) শাহ পরানের মাজার, সবুজ পাহাড়, লালা খাল, জাফলং-ডাউকি ল্যান্ড বর্ডার আর বিশাল হাওর। এগুলোও তো কম নয়।

জাফলং পৌঁছে একটু উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে ওপারে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সাজানো ভারতের ডাউকি শহর দেখতে পাওয়া যাবে। ডাউকি পাহাড় থেকে ছুটে আসা পাহাড়ের পানি এপারে এসে হয়েছে খরস্রোতা নদ ‘পিয়াইন’ আর ‘ধলাই’। নদের এপাড়ের ঘাটে নৌকা ভাড়া করে চলে যেতে হবে ওপাড়ে, যেখানে আছে সংগ্রামপুঞ্জি ঝরনা। সেখান থেকে দেখা যায় নয়নাভিরাম ডাউকি পাহাড় থেকে অবিরাম প্রবহমান ডাউকি জলপ্রপাত আর ঝুলন্ত ব্রিজ। বর্ষায় পিয়াইন নদে নৌকাভ্রমণের অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিন আপনার মানসপটে ভাসবে।

পিয়াইনের পাশে স্তূপে স্তূপে পাথর সাজানো। স্বচ্ছ পানি দেখলে একেবারে মন জুড়িয়ে যায়। আবার হুট করে নামা বৃষ্টি অন্য জগতে নিয়ে যায়—হিমশীতল পানি দেয় অন্য রকম আবেশ। এখানে নৌকাভ্রমণ সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। এটা একটা অনন্য অভিজ্ঞতা।

জাফলংয়ের সৌন্দর্যের একটি বড় অংশ এখানকার পাথর। হ্যাঁ অবাক হওয়ার কিছু নেই। সারাবিশ্বেই অনেক সুন্দর জায়গার প্রাণ পাথর। এখানেও তাই। সহস্র বছর ধরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া পাহাড়ের নুড়ি থেকেই এই পাথরের স্তূপের সৃষ্টি। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে বিশাল সব চা-বাগান। আশপাশেই আছে চুনাপাথরের খনি। স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতির মেলবন্ধনে দারুণ আবহ সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে এখানকার স্থানীয় বাজার ঘুরলেই পাবেন আদিবাসীদের হস্তশিল্প আর গয়না। ফিরতি পথে স্মৃতিস্বরূপ নিয়ে আসতে পারেন এসব। স্বচ্ছ পানি আর সবুজের আবহে জাফলং ভ্রমণ আপনার স্মৃতির পাতায় নিশ্চয়ই দারুণ অভিজ্ঞতা জুড়ে দেবে। আর যেমনটা বলেছি, সারল্যমাখা এই প্রকৃতির কোলে আপনি কদিন মানসিক প্রশান্তিতে থাকবেন। আবার যখন ফিরবেন দখল-দূষণের নগরীতে তখন মানসিক প্রশান্তিই আপনাকে দেবে শান্তি।

সূত্র: ইত্তেফাক